বিজ্ঞান, ধর্ম এবং অপবিজ্ঞান - কোথায় টানব সীমারেখা?

জাহেদ আহমদ

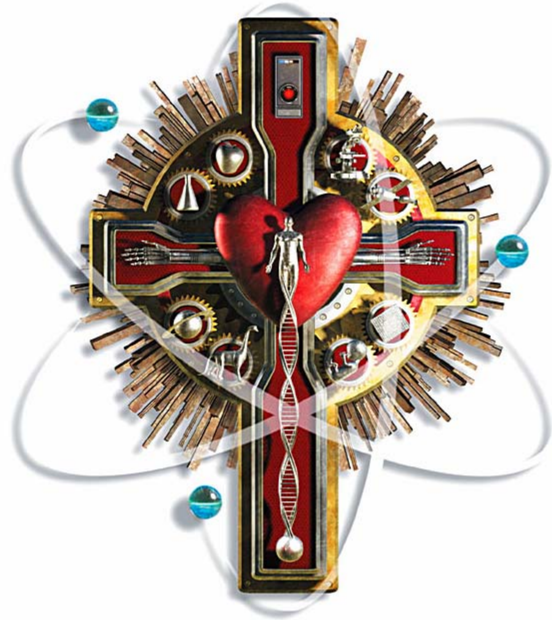

আমরা জানি বিজ্ঞানীরা সত্যের সন্ধান করে থাকেন, কিন্তু এ রকম দাবীতো আরো অনেকেই করতে পারেন যেমন- ধর্মতাত্ত্বিক, দার্শনিক, কিংবা কবি-সাহিত্যিকেরা। কেননা মহাবিশ্ব, পৃথিবী এবং এর তাবত রহস্যাদি কেবল বিজ্ঞানীদেরই নয়, বরং সকল কালের চিন্তাশীল মানুষদেরই কমবেশী ভাবিয়েছে। তাহলে প্রশ্ন আসেঃ একজন বিজ্ঞানীর চিন্তা এবং কাজের ধরণের সাথে একজন অবিজ্ঞানী চিন্তাশীল মানুষের চিন্তা ও কাজের তফাৎ কি? অন্য যে কোন সময়ের চাইতে বর্তমান সময়ে এই প্রশ্নটির উত্থাপন এবং এর যথাযথ বিশ্লেষণ বিশেষ জরুরী, কেননা বিজ্ঞানের সাথে ধর্মগ্রন্থের অদ্ভূত এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন ঘটানোর চেষ্টা চলছে বেশ কিছুদিন যাবত। হিন্দু-ইসলাম-খ্রিস্টান তিন ধর্মের কতিপয় স্বার্থান্বেসী অর্বাচীনেরা বিপুল যজ্ঞ সহকারে দিনের পর দিন এই অপকর্মটি চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের আবির্ভাব এবং সাধনার লক্ষ্য যেখানে সমগ্র মানবজাতি, সেখানে এই সব কূপমুন্ডুকেরা বিজ্ঞানের বিভাজন ঘটাচ্ছে 'বৈদিক বিজ্ঞান,' 'ক্বোরাণিক বিজ্ঞান' এবং 'বাইবেলীয় বিজ্ঞান' ইত্যাদি নামে যা আসলে অপবিজ্ঞান (pseudoscience) বৈ আর কিছুই নয় (*কেন*- সে ব্যাখ্যায় পরে আসছি)। সাধারণ মানুষজনতো বটেই, এদের অপপ্রচারে অনেক শিক্ষিত মানুষজন ও বিভ্রান্ত হচ্ছেন। এর একটি (কিন্তু একমাত্র নয়) কারণ হচ্ছে-বিজ্ঞান বিশেষ করে একজন বিজ্ঞানীর কাজের ধরণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জ্ঞানের অভাব। তবে অনেককে দেখা যায় বিজ্ঞান বিষয়ে উঁচু ডিগ্রী থাকা সত্ত্বে ও আদম-হাওয়ার কাহিনী থেকে শুরু করে জ্বীণ-ভুতে ও পর্যন্ত বিশ্বাস করে থাকেন। এর কারণ কি? সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিজ্ঞান বিষয়ে একটা ডিগ্রি নেয়া আর বিজ্ঞানমনষ্কতা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা দুটি জিনিস। একজন মানুষের মনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য কেবল একটা টেকনিক্যাল বিষয়ে সনদ (যতই উচ্চ পর্যায়ের হোক না কেন) যথেষ্ট হতে পারে না। দরকার সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞান সম্পর্কে অন্তত ন্যূনতম ধারণা। কিন্তু আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই সুযোগ খুবই কম। বিজ্ঞানের ছাত্রদের একদিকে যেমন দেখা যায়- ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিদ্যা সম্পর্কে ভয়াবহভাবে অজ্ঞ; তেমনি কলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাছে বিজ্ঞান চিরকালই রয়ে যায় 'কেবল মাত্র মেধাবীদের' একটা বিষয়। যাঁরা ব্যতিক্রম, পুরোটাই তা নিজের চেষ্টায়। আর সে জন্যই বোধ করি, আরজ আলী মাতুব্বর, অধ্যাপক আহমদ শরীফ প্রমুখেরা বিজ্ঞানের কোন ডিগ্রী না নিয়ে ও চিন্তা-চেতনায় ছিলেন খাঁটি বিজ্ঞানমনষ্ক আর ডঃ শমসের আলীর মত একজন মেধাবী বিজ্ঞানের ডক্টরেট সময় কাটাচ্ছেন ক্বোরাণের আয়াতের মধ্যে ডি-এন-এ অণুর গাঠনিক যোগসূত্র (?) বের করে। অপবিজ্ঞানের প্রসার ও জনপ্রিয়তার পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এই - বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে ও এটি যে আজকাল আমাদের জীবনকে অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করছে তা প্রায় সকলেই বুঝি। বিজ্ঞান ছাড়া আধুনিক সভ্যতা টিকে থাকতে পারবে না। আবার ধর্মের প্রভাব (ইতিবাচক-নীতিবাচক দুই অর্থে) ও মানুষের জীবনে অপরিসীম। তেল আর জলের মত বিজ্ঞান এবং ধর্ম দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় হলে ও বেশিরভাগ মানুষ এ দুটোর কোনটিকেই ছাড়া জীবন কল্পনা করতে পারে না। কাজেই অসম্ভব হলে ও দুটোই সে আকঁড়ে ধরে থাকতে চায়। তাতে হয়তো কারো অসুবিধা থাকার কথা নয়। কিন্তু কেবল সস্তা জনপ্রিয়তা, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার জন্য বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রভাবের নিকট পরাভূত স্বীয় ধর্মের লোকজনের মিথ্যা মনোতুষ্টি যোগাতে যখন সরাসরি অপপ্রচার চালানো হয় যে, বেদ-বাইবেল-ক্বোরাণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের মধ্যে স্বয়ং বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কারের ইংগিত রয়েছে, তখন তা কেবল জঘন্য মিথ্যাচারই নয়, এটি একটি মারাত্নক অনৈতিক অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। কেননা এই সব দাবী দ্বারা সত্যিকারের বিজ্ঞানীদের বহু বছরের

সাধনাকে (অনেক সময় বিজ্ঞানের কোন একটি বিষয়ের আবিষ্কারক হিসেবে কেবল একজন বিজ্ঞানীর নাম আমরা জানলে ও প্রায় সময়ই দেখা যায় এর পেছনে রয়েছে পূর্বেকার সময়ের এক বা একাধিক বিজ্ঞানীর নিরন্তর শ্রম ও সাধনার ইতিহাস) অস্বীকার এবং খাটো করা হয় (আইনস্টাইন শুনলে কেমন বোধ করতেন যে তিনি কোরাণ বা বাইবেলের মধ্যে আপেক্ষিক তত্ত্বের সূত্র খুঁজে পেয়েছেন!)। এ সব অপবিজ্ঞানের প্রবক্তারা যে আরেকটি মারাত্মক ক্ষতির কাজ করে তা হল- একজন মানুষের যুক্তি, পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের চিন্তাশক্তিকে প্যারালাইজড্ করে দেয়।

বিজ্ঞানী যে ভাবে কাজ করেন/বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (scientific methodology)-র ধাপ সমূহঃ

বিজ্ঞান (science)-কে অপবিজ্ঞান বা pseudoscience থেকে আলাদা করতে হলে আমাদের একটু ধারণা থাকা দরকার একজন বিজ্ঞানী কি ভাবে কাজ করেন অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে। বিজ্ঞান হচ্ছে নিরন্তর সাধনা এবং অধ্যয়নের বিষয়; তবে বিজ্ঞানীর অধ্যয়ন, সাধনা ও শ্রমের সাথে সাধু-সন্নাসী-তান্ত্রিক-পীর-ফকিরের নির্জন 'আধ্যাত্মিক ধ্যান'-এর বিস্তর ফারাক রয়েছে। বিজ্ঞানীর গবেষণালব্ধ ফলাফল তাই 'স্বপ্নে পাওয়া গাছ' জাতীয় কোন ব্যাপার নয়। এটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দিনের পর দিন গভীর অধ্যয়ন, সতর্ক পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, বিশ্লেষণ এবং অধ্যবসায়ের ফলে ঘটে থাকে; তারপর ও দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞানীকে একাধিকবার একই বিষয়ে পরীক্ষার পুনারাবৃত্তি করতে হয় যতক্ষন না পর্যন্ত কাংখিত মানের ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে।

নীচের চিত্রে একজন বিজ্ঞানীর কাজের পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলি দেখানো হল।

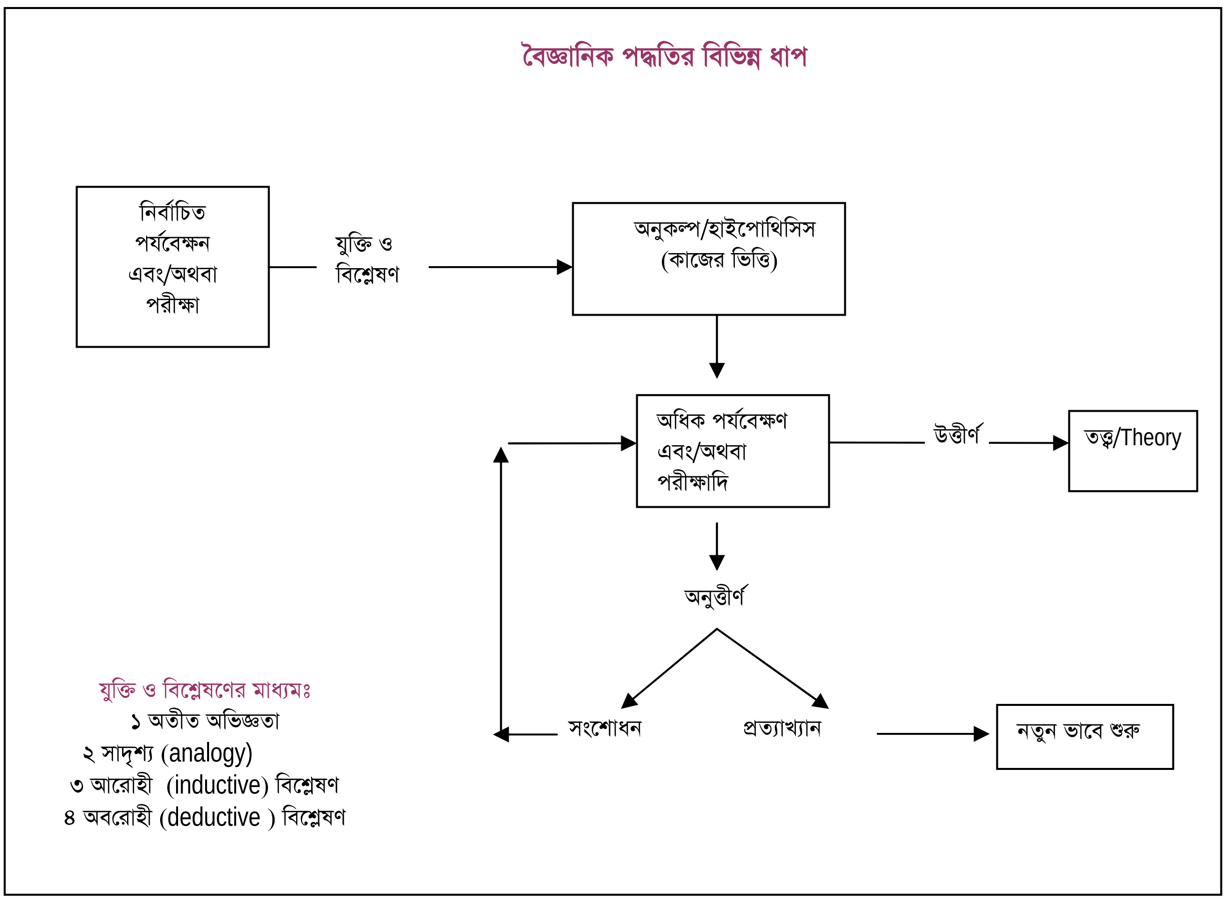

বিজ্ঞান (science) বনাম অপবিজ্ঞান (pseudoscience):

বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে আমরা মোটামোটি একটা ধারণা পেলাম। এবার দেখা যাক, অপবিজ্ঞান জিনিসটা আসলে কি? সহজ ভাষায়, ***বিজ্ঞানের মোড়কে ঢাকা কিন্তু আসলে বিজ্ঞান নয় এমন যে কোন তত্ত্ব, বক্তব্যকেই অপবিজ্ঞান বলা যায়।*** অপবিজ্ঞানের কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে- জ্যোতিষীশাস্ত্র (astrology) (আমি জ্যোতির্বিদ্যা বা astronomy এর কথা বলছি না, যা অবশ্যই বিজ্ঞান); ইন্টালিজেন্ট ডিজাইন (Inelligent Design); সৃষ্টিতত্ত্ব (Creationism); বিকল্প মেডিসিন যেমনঃ ম্যাগনেট থ্যারাপি, হোমিওপ্যাথি, আকুপাংচার, ডায়ানেটিক্স ইত্যাদি; টেলিপ্যাথি; ধর্মগ্রন্থসমূহ যেমনঃ বেদ-বাইবেল-ক্বোরাণ ইত্যাদিতে বিজ্ঞানের সূত্র লুকায়িত রয়েছে এমন সব দাবী। অর্থাৎ বিজ্ঞান আর অপবিজ্ঞান হচ্ছে অনেকটা আসল সোনা আর নকল সোনার মত ব্যাপার। এটা সত্য যে, *চকচক করিলেই সোনা হয় না* জেনে ও আমরা অনেক সময় নকল সোনাকে আসল সোনা মনে করে ভুল করি। সেজন্য খাঁটি সোনা ও নকল সোনার বৈশিষ্ট্য এবং তফাত জেনে রাখা ভাল। তবে স্থানাভাবে আলোচ্য প্রবন্ধে অনেক রকম অপবিজ্ঞানের মধ্যে আমি মূলত ধর্মীয় অপবিজ্ঞানের উপরই আলোকপাত করব। আশা করি পাঠক-পাঠিকারা তাতে অন্যান্য প্রকার অপবিজ্ঞান সম্পর্কে ও একটা ধারণা পাবেন। শুরুতেই দেখা যাক বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের আসলে কি কি পদ্ধতি ও বিশ্লেষণগত পার্থক্য রয়েছে-

প্রাচীন কালে মানুষেরা প্রাকৃতিক ব্যাপারসমূহ বিশেষত দূর্যোগ, খরা-বন্যা ইত্যাদির ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে সর্বদাই কোন না কোন অতি প্রাকৃতিক সত্ত্বা বা শক্তিকে টেনে নিয়ে আসত। এ যুগে ও বহু ধার্মিক মুসলিম-হিন্দু-খ্রিস্টানের কাছে সত্যের উৎস হিসেবে *ঐশী বাণী* বিজ্ঞানের মতই সত্য। **ধর্মের সংজ্ঞাতে বিবেচনায় আসে বহু বিজ্ঞানীদের এ রকম ধর্মীয় পরিচয় ও আছে। কিন্তু *প্রাকৃতিক জগৎ কি ভাবে কাজ করে,* এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে একজন বিজ্ঞানী কোন দৈবিক বা ঐশী বাণী (divine revealation)-র দ্বারস্থ হন না, কিংবা অতিপ্রাকৃতিক (supernatural) কোন ব্যাখ্যা দাঁড় করান না অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতের ব্যাখ্যা একজন বিজ্ঞানী প্রাকৃতিক ভাবেই খুঁজেন ।**

দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের অন্যতম একটি পার্থক্য হচ্ছে এর উন্মুক্ততা (openness)। ধর্মগ্রন্থের বাণীকে *অলংঘনীয় সত্য* হিসেবে গণ্য করা হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কোন তত্ত্বেরই রয়েছে একাধিক সংস্করণ (version)। নতুন পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ-প্রমাণ-যুক্তি ও বিশ্লেষণের কাছে বিজ্ঞানের পুরানো একটি তত্ত্ব হার মানতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠির বিশ্বাস, মতামত বা কর্তৃত্বের কোন মূল্য নেই। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের বাণীকেই 'চরম ও পরম সত্য' (ultimate truth) বলে ধরে নেয়া হয়। যেমনঃ মুসলমানেরা ক্বোরাণকে *'সর্বকালের সকল মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান'* বলে মনে করেন।

তৃতীয়তঃ একটি বিষয়ে নতুন কোন প্রশ্ন, সংশয়, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণকে বিজ্ঞান স্বাগত জানায়। এক অর্থে বলতে গেলে, এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই বিজ্ঞান এতদূর এগিয়েছে। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে সংশয়বাদের কোন স্থান নেই। ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী *সংশয়বাদী* বা *অবিশ্বাসীদের* জন্য পরকালে ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

নীচের চিত্রে বিজ্ঞান, ধর্ম এবং অপবিজ্ঞানের কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্যসমূহ দেখানো হল।

বিজ্ঞান (Science)	অপবিজ্ঞান (Pseudoscience)	ধর্ম (Religion)
সত্যের উৎসঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি	ধর্ম এবং বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যপূর্ণ (ad hoc) মিশ্রণ। প্রকৃতি সম্পর্কে অপ্রমাণিত, অপরীক্ষিত বা ভুল প্রমাণিত বক্তব্য কেবলমাত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়।	সত্যের উৎসঃ 'ঐশী' বা 'দৈবিক বাণী'
সবক্ষেত্রে সমানঃ নিরপেক্ষ		সংস্কৃতি ও ব্যাখ্যার ধরণ অনুযায়ী তারতম্য ঘটেঃ নিরপেক্ষ নয়।
যে কেউ প্রশিক্ষণ দ্বারা চর্চা করতে পারেন		'ঐশী'/'দৈবিক বাণী' কেবল নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ
সত্য শর্তসাপেক্ষ (provisional)		সত্য 'চূড়ান্ত' (ultimate)বলে গণ্য
প্রমাণাদিঃ পর্যবেক্ষন/পরীক্ষা		প্রমাণাদিঃ নেই। প্রয়োজন কেবল বিশ্বাস।
বিষয় বস্তুঃ প্রাকৃতিক জগৎ		বিষয় বস্তুঃ আধ্যাত্মিক জগৎ
	বিঃদ্রঃ এগুলি একটি থেকে অন্যটি পুরোপুরি স্বতন্ত্র (mutually exclusive)। দুটি বিষয় মানব অস্তিত্বের পৃথক দুটি ক্ষেত্র নিয়ে চর্চা করে।	

অপবিজ্ঞানের কি সুনির্দিষ্ট কোন প্যাটার্ণ বা বৈশিষ্ট্য আছে? কি ভাবে বিজ্ঞানকে অপবিজ্ঞান থেকে সনাক্ত করা যাবে সহজেই? বিভিন্ন ধরণের অপবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কয়েকটি সামঞ্জস্য চোখে পড়ার মত। যেমন-

- **টেস্টিমোনিয়ালস্ (testimonials) -এর আধিক্যঃ** সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির মূলনীতি যথাঃ পরীক্ষা, ফলাফল, তথ্য-উপাত্ত (data) বিশ্লেষণের পরিবর্তে অপবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এক বা একাধিক সুপরিচিত বা খ্যাতনামা ব্যক্তির মৌখিক বা লিখিত প্রশংসাসূচক বাণীর (testimonials) ছড়াছড়ি দেখা যায়। একে বলা হয় Halo effect অর্থাৎ যখন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে অভিজ্ঞ বা সুপরিচিত একজন ব্যক্তি তাঁর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার বাইরের কোন একটি বিষয় সম্পর্কে একটি মনতব্য করেন, সাধারণ মানুষ তাতে সেই বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমানে প্রভাবিত হতে পারে। যেমনঃ আমেরিকান সাইকিক (আমাদের দেশের জ্যোতিষীর সমান) জন নিডনাগেল (John Niednagel) ব্রেইন টাইপিং (এক ধরণের অপবিজ্ঞান)কে এক ধরনের বিজ্ঞান বলে বাজারজাত করতে গিয়ে বিভিন্ন খ্যাতনামা এথলেট এবং কোচদের প্রশংসা সূচক মনতব্য ব্যবহার করেন। আমাদের দেশে ও এরশাদ সরকারের আমলে একবার দেখা গেল, সাঈদাবাদী হুজুর আবিষ্কৃত (!) জ্যোতি হিমেল পাউডারের বিজ্ঞাপণে স্বয়ং তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট (মওদুদ আহমদ)সহ অনেক মন্ত্রীবর্গের নাম। পরে জানা যায়, ব্যাংককের নিম্নমানের একধরণের পাউডারের সাথে কর্পূরের মিশ্রণে হুজুর হিমেল পাউডার বাজারজাত করেছিলেন। এরকম অনেক কবিরাজ, আধ্যাত্নিক পীর-ফকিরেরা পত্রিকার বিজ্ঞাপণে লোকজনের ভূঁয়া নাম-ছবি ও ঠিকানা ব্যবহার করে। আমেরিকান জ্যোতিষী জন নিগনাডেল ব্রেইন

টাইপিং এর প্রচারনায় বেশ কিছু খ্যাতনামা নিউরো-বিজ্ঞানীদের নাম ও ব্যবহার করেন তাঁদের অজান্তে। পরবর্তিতে ব্যাপারটি সম্পর্কে ওই সব বিজ্ঞানীরা জানতে পেরে তীব্র আপত্তি জানান। শেষ পর্যন্ত জন বিজ্ঞাপণ থেকে তাঁদের নাম সরাতে বাধ্য হন। ইন্টারনেটে একবার একটি ইসলামিক ওয়েবসাইটে দেখলাম ক্বোরাণে বিজ্ঞান আছে বলে সাফাই গাইতে গিয়ে আমেরিকান ভ্রুণতত্ত্বের একজন প্রফেসরের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়েবসাইটে প্রফেসরের সাথে যোগাযোগের কোন ঠিকানা না পেয়ে শেষে ইন্টারনেট সার্চ করে আমি তাঁর কাছে আমার প্রশ্নসহ ই-মেইল পাঠালাম, কিন্তু কোন উত্তর পাইনি।

- **বৈজ্ঞানিক পরিভাষা** (scientific terminology) **এর অপব্যবহারঃ** অপবিজ্ঞান বিজ্ঞানের ভাষা ধার করে কথা বললে ও তা কখনোই বিজ্ঞান নয়। ডাক্তারের ভাষা নকল করে যে কেউ কথা বললেই তিনি ডাক্তার হয়ে যান না। ঠিক তেমনি, বিজ্ঞানীদের পরিভাষা (terminology) নকল করে কেউ একজন একটি অবৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে মনতব্য করলেই সেটি বিজ্ঞান হয়ে যায় না। যেমনঃ অধিকাংশ অপবিজ্ঞানী ও ভূঁ য়া বিজ্ঞানী তাদের প্রচারণাতে *রিসার্চ বা গবেষণা* শব্দটির উল্লেখ করে থাকে। আমাদের যেটি জানতে হবে, রিসার্চ বা গবেষণা মানেই তা বৈজ্ঞানিক গবেষণা নয়, কেননা একটু আগে আমরা দেখেছি বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ণ রয়েছে। কাজেই অবৈজ্ঞানিক ভাবে কেউ বিশ বছর ধরে একটি ব্যাপার নিয়ে ভাবলে বা কাজ করলেই তা বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়ে ওঠে না। সে জন্যেই অপবিজ্ঞানের প্রচারকরা তাদের তথাকথিত আবিষ্কার, গবেষণা নিয়ে এত চেঁচামেচি করলে ও সেগুলি কোন *স্ট্যান্ডার্ড* সাইনস্ জার্ণালে প্রকাশ হয়েছে কি-না জিজ্ঞাসা করলে তা এড়িয়ে যায়।
- **অভিনব বিজ্ঞাপণীয় কায়দাঃ** অপবিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকেরা নিজেদের প্রচারে প্রায়শই পাঠক-দর্শক-শ্রোতাদের মনে এই ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে যে, তারা বিশাল রকমের অভাবনীয় একটা ব্যাপার (breakthrough) ঘটিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আমরা জানি, একজন বিজ্ঞানী বড় কিছু একটা আবিষ্কার করলে সর্বপ্রথম সেটি সাইন্টিফিক গবেষণা জার্ণালে পাঠান। ইন্টারনেট, টিভি বা পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ দিয়ে বিজ্ঞানীকে ঘোষণা দেয়ার দরকার হয় না তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে।
- ক্বোরণ-বাইবেলে বিগ ব্যাংগ (Big Bang) সহ অন্যান্য দাবীর ক্ষেত্রে একটা জিনিস লক্ষ করবেন। যখন একজন বিজ্ঞানী বিখ্যাত কোন একটি বিখ্যাত আবিষ্কার সম্পন্ন করে ফেলেন, কেবল তখনই (তার আগে নয়) অপবিজ্ঞানের প্রবক্তারা দাবী তুলে, এটি সম্পর্কে ক্বোরাণ-বাইবেল ইত্যাদিতে আগেই বলা হয়েছে; আবিষ্কারের এক মুহূর্ত আগ পর্যন্ত এসব অক্ষমরা কিন্তু নিজ নিজ ধর্ম গ্রন্থে সেই সব তথাকথিত লুক্কায়িত সূত্র সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। যদি তা না হত, তাহলে এরা নিজেরা কেন বিগ ব্যাংগ তত্ত্ব আবিষ্কার করেনি? ক্বোরাণ-বাইবেল বহু শত বছর থেকে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছে, তাহলে বিগ ব্যাংগ তত্ত্বের আবিষ্কারের জন্য কেন আমাদের বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল? এখানে অপবিজ্ঞানের প্রবক্তাদের সাথে পাক-ভারত উপমহাদেশীয় জ্যোতিষীদের বেশ মজার মিল রয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর বেশ কিছু জ্যোতিষী পত্রিকায় নিজেদের বিজ্ঞাপণে লিখতঃ ইনি সেই বিস্ময়কর মহাপুরুষ যিনি ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর তারিখ ও দিনক্ষণ আগেভাগেই নির্ভুলভাবে (?) বলে দিয়েছিলেন। যখন কেউ কেউ জানতে চাইলেন, ইন্দিরা গান্ধী জীবিত থাকাকালে কখন কোন পত্রিকায় বা সাক্ষাতকারে জ্যোতিষীটি এই ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন, কোন উত্তর পাওয়া গেল না। এরকম বাংলাদেশে ও একাধিক বার দেখা গিয়েছে।
- মোটামোটি সঠিক ভাবে বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা আবিষ্কারের বর্ণনার শেষে কিংবা পাশাপাশি বেছে বেছে হাজির করা হয় ক্বোরাণ-বাইবেলের এমন সব আয়াত বা বাণী যেগুলির সাথে বিজ্ঞানের স্পষ্ট কোন সামঞ্জস্য তো নেই, বরং এগুলির খুব সহজেই হতে পারে একাধিক ব্যাখ্যা। কিন্তু বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির সাথে পরিচয় না থাকলে এসব সচিত্র, আকর্ষনীয় বর্ণনা এবং রেফারেনসের আধিক্যে ততোক্ষণে একজন সাধারণ পাঠক-পাঠিকা সহজেই কুপোকাত হয়ে যেতে পারেন।
- বড় বড় বিজ্ঞানীর এক বা একাধিক কোটেশনকে সম্পূর্ণ বিকৃত এবং ভূল অর্থে প্রয়োগ করা হয়। আইনস্টাইনের উদাহরণ টানা যাক। আমি আহতভাবে লক্ষ করেছি আইস্টাইনের ধর্মীয় এবং দার্শনিক বক্তব্য সম্পর্কে বেশির ভাগ মুসলমান/হিন্দু/খ্রীস্টানের জ্ঞান শুধু একটি উদ্ধৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধঃ "Science without religion is lame, religion without science is blind." অর্থাৎ 'ধর্ম ব্যতিত বিজ্ঞান খোঁড়া এবং বিজ্ঞান ব্যতিত ধর্ম অন্ধ।' কিন্তু আইনস্টাইন যে প্রচলিত ধর্মের কোনটিতেই (যদি ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি তাঁর একটু আস্থা ছিল) বিশ্বাস করতেন না এবং তাঁর ঈশ্বর এবং ধর্মের ধারণা যে সরাসরি ক্বোরান-বাইবেলের ঈশ্বর ধারণার বিরোধী, সে সম্পর্কে খুব নগণ্য সংখক মানুষ অবহিত রয়েছেন। আসুন, আইনস্টাইনের নিজের মুখ থেকে শোনা যাক ধর্ম এবং ঈশ্বর বলতে আসলে তিনি কি বুঝিয়েছেন।

> *আমি ধর্মতত্ত্বে বর্ণিত এমন কোন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না যিনি ভালকে পুরষ্কৃত করেন আর মন্দকে শাস্তি দেন।*
>
> "I do not believe in the God of theology who rewards good and punishes evil." [Albert Einstein, as quoted in a memoir by *Life* editory William Miller in *Life*, May 2, 1955]

> *আমি এ রকম সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব কল্পনা ও করতে পারি না যিনি তাঁর আপণ সৃষ্টিকে পুরষ্কৃত এবং তিরষ্কৃত করেন, যাঁর উদ্দেশ্য আমাদের নিজেদের উদ্দেশ্যের আদলে তৈরী; সংক্ষেপে তিনি এমন একজন ঈশ্বর যিনি দূর্বল ও নশ্বর মানুষেরই প্রতিচ্ছবি। আমি এ ও মনে করি না যে, শরীরের মৃত্যুর পরে মানুষ বেঁচে*

থাকে যদি ও দূর্বল চিত্তের লোকজনের মনে ভীতি কিংবা হাস্যম্পদ অহংবোধ থেকে এসব বিশ্বাস দানা বাঁধে।

"I cannot imagine a God who rewards and punishes the objects of his creation, whose purposes are modeled after our own -- a God, in short, who is but a reflection of human frailty. Neither can I believe that the individual survives the death of his body, although feeble souls harbor such thoughts through fear or ridiculous egotisms." [Albert Einstein, obituary in New York Times, 19 April 1955]

এবার অপবিজ্ঞানের কয়েকটি নমুনা এবং সেগুলির যথাযথ ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাকঃ

একঃ অনেক শিক্ষিত মুসলমান ও বিজ্ঞান সম্পর্কে নিজেদের দীনতার প্রকাশ ঘটান যখন তাঁদের কেউ কেউ মরিস বুকাইলি নামের সৌদী রাজপরিবারে চাকরী করা একজন খৃস্টান ডাক্তারের (কোন বিজ্ঞানী নয়) একটি বইকে বিজ্ঞান গবেষণার উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। বইটির নামঃ 'Bible, Quran and Science' *(বাইবেল, ক্বোরাণ এবং বিজ্ঞান)।* উপরে অপবিজ্ঞানের যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা বললাম, সেগুলির বেশির ভাগই বইটির মধ্যে উপস্থিত অর্থাৎ বিজ্ঞানের কিছু বিষয়াদি বর্ণনার পাশাপাশি সেগুলিকে তুলনা করা হয়েছে বাইবেল এবং ক্বোরাণের কতিপয় অস্পষ্ট এবং সহজেই বিভ্রান্ত করা যায়- এরকম কিছু আয়াতের সাথে। বলা হয়েছে বাইবেল এবং ক্বোরাণের মধ্যে অনেক মিল থাকলে ও ক্বোরাণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সত্যিকারের বিজ্ঞান। কোনটি বিজ্ঞান আর কোনটি বিজ্ঞান নয়, তা কি একজন চিকিৎসক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? মরিস বুকাইলির বিজ্ঞান গবেষক হিসেবে কি কোন গ্রহন যোগ্যতা আছে? উত্তর, না। আর ও মজার ব্যাপার- বাইবেল, ক্বোরাণ এবং বিজ্ঞানের এর মধ্যে ক্বোরাণকে চূড়ান্ত সত্য (?) বললে ও মরিস বুকাইলি নিজে কিন্তু মুসলমান হননি। হওয়ার অবশ্য দরকার ও নেই কারণ- জানা গেছে, ক্বোরাণকে আধুনিক পাঠক-পাঠিকার কাছে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে সৌদী শাসকরা বুকাইলিকে দায়িত্ব দিয়েছিল তিনি যেন একটি ইম্প্রেসিভ বই লিখে দেন। বিনিময়ে বুকাইলি পেয়েছেন বিরাট অঙ্কের পেট্রোডলার।

দুইঃ বাংলাদেশে ডঃ শমসের আলী *"Scientific Indications in The Holy Quran"* নামক বইটির তৃতীয় কভার পেজে ক্বোরাণের একটি আয়াত উল্লেখ করে তার সাথে বড় করে ডি-এন-এ অণুর ছবি জুড়ে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, ক্বোরাণে ডি-এন-এ-র ব্যাপারে পর্যন্ত ইংগিত রয়েছে। আয়াতটি এ রকম-

এবং তোমাদের এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণিদের গঠন-প্রকৃতিতে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে সংবাদ (৪৫:৪)

দেখা যাক ব্যাপারটা আসলে সত্যি কি-না।

ডি-এন-এ অণুর পুরো নাম- ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড। একে বলা হয় 'জীবদেহের প্রধান অণু' (*The master molecule of life*)। কেউ কেউ আদর করে ডি-এন-এ-কে ডাকেন 'প্রচার মাধ্যমের প্রেয়সী' (*The darling of the media*)| যাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র/ছাত্রী নয়, তাঁরা ও জ্বীণ থেরাপি, ক্লোনিং, মানব জিনোম প্রকল্প (*Human Genome Project*) ইত্যাদি নাম শুনে থাকবেন। এ সবগুলি কাজ ও গবেষণার মূল টার্গেট বা অস্ত্র হচ্ছে ডি-এন-এ (যার সাথে *জিণের* পার্থক্য হচ্ছে- বিশাল দৈর্ঘ্যের একেকটি ডি-এন-এ অণুতে রয়েছে অনেকগুলি আলাদা আলাদা অংশ যা *জিণ* বলে পরিচিত)। এই ডি-এন-এ-র উপাদান ও গঠন আবিষ্কার করতে বিজ্ঞানীদের সময় লেগেছে প্রায় একশ' বছর। যদি ও ১৯৫৩ সালের জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক এর ডাবল-হেলিক্স মডেল ডি-এন-এ আবিষ্কারের ইতিহাসে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বায়োলজি বা মলিকুলার বায়োলজির যে কোন ছাত্র/গবেষক মাত্রই জানেন- পূর্ব্বর্তী বিজ্ঞানীদের গবেষণা এবং পর্যবেক্ষনের সূত্র ছাড়া ১৯৫৩ সালের যুগান্তকারী ঘটনাটি সম্ভব ছিল না। আমি নিচে ডি-এন-এ আবিষ্কারের ক্রোনোলজিকাল সালগুলো উল্লেখ করছি-(সূত্রঃ nature, *human genome issue*)

- ১৮৬৯ সাল - সর্বপ্রথম জীবকোষ থেকে ডি-এন-এ পৃথক করা হয়।
- ১৮৭৯ সাল - মাইটোসিস কোষ বিভাজন পর্যবেক্ষন করা হয়।
- ১৯০০ সাল - জোহান ম্যান্ডেলের মটরশুঁটি বিষয়ক গবেষণার সন্ধান লাভ।
- ১৯০২ সাল - বংশগতি (hereditary) বিষয়ে ক্রমোজোম তত্ত্বের ধারণার উদ্ভব।
- ১৯০৯ সাল - সর্বপ্রথম 'জিণ' শব্দটি চালু হয় (এটি ক্বোরাণে বর্ণিত কোন 'জীন' নয়- লেখক)।
- ১৯১১ সাল - ফ্রুট ফ্লাই *(Drosophila melanogaster)* নিয়ে গবেষণা ক্রমোজোম তত্ত্বের ধারণাকে শক্তিশালী করে।
- ১৯৪১ সাল - *এক জিণ-এক এনজাইম* তত্ত্বের ধারণা।
- ১৯৪৩ সাল - এক্সরে ডিফ্রেকশন (Xray diffraction) টেকনিকের প্রয়োগ করে ডি-এন-এ-র উপর গবেষণা করা হয়।
- ১৯৪৪ সাল - ডি-এন-এ ট্রানস্ফরমেশন (transformation) নীতির আবিষ্কার।
- ১৯৫২ সাল -জিণ যে আসলে ডি-এন-এ দিয়ে তৈরী, তা জানা যায়।

- ১৯৫৩ সাল -জেমস ওয়াটসন, ফ্রান্সিস ক্রিক এবং উইলকিনস ডাবল-হেলিক্স মডেল-এর মাধ্যমে ডি-এন-এ-র গঠন ও উপাদান ব্যাখ্যা করেন (সেসময় ওয়াটসনের বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর -লেখক)। ১৯৬৩ সালে সে জন্য তাঁদেরকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়।

এবার পাঠক-পাঠিকার কাছে আমার প্রশ্ন, উপরের আলোচনা থেকে কি মনে হয় ক্বোরাণের ওই আয়াত আসলে ডি-এন-এ অণুর গঠনের ব্যাপারেই ইংগিত প্রদান করে? এই মূর্খতার (নাকি, শঠতার) শেষ হবে কবে ?

তিনঃ ইসলামিক বা ক্বোরাণিক বিজ্ঞানের প্রবক্তাদের অনেকগুলো আজগুবি দাবীর মধ্যে একটি হল, আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বের (embryology) সাথে নাকি ক্বোরাণের আয়াতের 'বিস্ময়কর' মিল (!) রয়েছে। দেখা যাক এই দাবীটি কতটা যৌক্তিক।

ক্বোরাণের আয়াত ৮৬:৬-৭ এ বলা আছে, শুক্রানু বা স্পার্ম মেরুদন্ড এবং বক্ষ পিঞ্জরের মাঝামাঝি স্থান থেকে উৎপন্ন হয় (সম্ভবত এখানে কিডনীর ইংগিত দেয়া হয়েছে); কিন্তু আমরা জানি তা মোটে ও সত্য নয়, কেননা শুক্রানূর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে শুক্রাশয় (মিয়োসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায়)। ক্বোরাণের বহু জায়গায় বলা হয়েছে, *জমাট রক্ত থেকে মানুষের সৃষ্টি করা হয়েছে (২৩:১৪, ৭৫:৩৮, ৯৬:২);* যার সাথে বিজ্ঞানের অমিল ছাড়া কোন মিল নেই। 'জমাট রক্ত' প্রসংগ ঘুরে ফিরে বার বার কেন ক্বোরাণে আসল? এ রকম প্রশ্ন মনে আসতেই পারে। এর উত্তর খোঁজতে হলে আমাদের একটুখানি দৃষ্টি দিতে হবে মুহম্মদ পূর্ববর্তী সমাজ ও ইতিহাসের দিকে। মুহম্মদের জন্ম (৫৭০ খ্রিস্টাব্দ) এরিস্টটলের জন্মের (খ্রীস্টপূর্ব ৩৮৪) প্রায় একহাজার বছর পরে । দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞান তখন ও (এমনকি পরে) এরিস্টটলের চিন্তা-চেতনার মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছিল। স্বাভাবিক কারণেই এরিস্টটলীয় এ সব ধারণা কম বেশি মুহম্মদকে ও প্রভাবিত করেছিল । এ ক্ষেত্রে মুহম্মদের নিরক্ষরতা বড় কোন বাঁধা হওয়ার কথা নয়। যীশু, গৌতম বুদ্ধ ও নিরক্ষর ছিলেন। জমাটবাঁধা রক্ত (*আলাক্বা,* আরবীতে) থেকে জন্মের তত্ত্বটি এসেছে মূলতঃ গ্রীকদের কাছ থেকে। এরিস্টটলকে *জীব বিজ্ঞানের জনক* বলা হলে ও জীব সম্পর্কিত তাঁর অনেক তত্ত্বই কালক্রমে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যেমন- মানব প্রজনন সম্পর্কে এরিস্টটল এই ভ্রান্ত ধারণাতে বিশ্বাস করতেন যে, যৌবনবতী মহিলার ঋতুস্রাব (menstrual blood) এর উপর পুরুষ বীর্যের ক্রিয়ার ফলেই মাতৃগর্ভে শিশুর জন্ম হয়ে থাকে। জমাট বাঁধা রক্ত থেকে জন্মের ক্বোরাণিক তত্ত্বে এরিস্টটলের এই ভ্রান্ত ধারণারই প্রতিফলণ ঘটেছে। সন্দেহ নেই, ক্বোরাণের এই ধারণাটি মারাত্নকভাবে ভুল। অথচ অনেক মুমিন এই সত্যকে মেনে নিবেন না কেবমমাত্র এই অন্ধ বিশ্বাসের কারণে- *ক্বোরাণ আল্লাহর বাণী, কাজেই ভুলক্রটির উর্দ্ধে।* মূলতঃ ভ্রুনের পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরে এমন কোন পর্যায় নেই, যেখানে ভ্রুনকে জমাট রক্তের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কেবলমাত্র একটি পর্যায়ে এই ভুলটি হতে পারে অর্থাৎ, ভ্রুনকে জমাট রক্ত সদৃশ মনে হতে পারে, যদি মিসকারেজ (miscarriage) বা প্রাকৃতিক উপায়ে গর্ভপাত ঘটে। তর্কের খাতিরে ও যদি মেনে নেই ভ্রুনটি জমাট রক্ত সদৃশ, তাহলে ও ভুলে যাওয়া চলবে না- এটি কেবল মৃত ভ্রূণের ক্ষেত্রে ঘটে অর্থাৎ, যেটির আর পূর্ণাংগ মানব শিশুতে রূপান্তরিত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই।

জমাট রক্ত আসলে কী, সে সম্পর্কে প্রাণ রসায়ণিক (biochemical) ব্যাখ্যাটা এখানে জেনে নেয়া ভাল। আঘাত বা দূর্ঘটনার ফলে রক্তক্ষরণ ঘটলে শরীরে স্বাভাবিক নিয়মেই ক্ষত বা আঘাতের স্থানে রক্ত জমাট বাঁধে। কৈশিক রক্তনালীর (capillary blood vessels) চাইতে বড় যে কোন রক্তনালী থেকে রক্তক্ষরণ ঘটলে জখম বা আঘাতের স্থানে রক্ত জমাট বাঁধে যাতে অতিরিক্ত ক্ষরণ না ঘটতে পারে। এ ক্ষেত্রে অনুচক্রিকা বা প্লেটলেট (তিন প্রকার রক্ত কোষের একটি) এর ভূমিকা সর্বপ্রধান এবং সর্বপ্রথম। যখন শরীরে কোথাও কোন জখম বা আঘাত ঘটে, স্বাভাবিক অনুচক্রিকাগুলি তখন সক্রিয় অনুচক্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এ গুলির তখন আকৃতির পরিবর্তন ঘটে থাকে, এবং এরা আঠাঁলো হয়ে রক্তনালীর দেয়ালে জমা হয়ে প্লাগ (plug) তৈরী করে। এই সক্রিয় অনুচক্রিকাগুলি থেকে একই সময়ে রক্তপ্লাজমায় বিশেষ এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ ঘটে থাকে। অনেকগুলি জটিল প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে ফাইব্রিনোজেন তখন ফাইব্রিনে পরিণত হয়। ফ্রাইবিন হচ্ছে এক ধরণের অদ্রবণীয় প্রোটিন যা ফাইব্রিল নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুতা জাতীয় বস্তুর সমন্বয়ে জটিল জালিকার সৃষ্টি করে। রক্ত কোষ এবং প্লাজমা (উভয়ের সমন্বয়েই রক্ত গঠিত) তখন ফাইব্রিলের এই জালে আটকা পড়ে গিয়ে ক্লট বা জমাট রক্তের সৃষ্টি করে।

চারঃ জ্যোতিবির্জ্ঞান (Astronomy), মুসলিম জ্যোতিবির্জ্ঞানী এবং ক্বোরাণঃ গ্রহ-নক্ষত্র এবং জ্যোতিষ্কমন্ডলী সম্পর্কে 'মহাগ্রন্থ আল-ক্বোরাণের' ব্যাখ্যা একটু পর্যালোচনা করা যাক। ভ্রূণবিদ্যার মত এটি ও 'ক্বোরাণিক বিজ্ঞানী' এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক মুমিন বান্দাদের আরেকটি অতি প্রিয় বিষয়। সন্দেহ নেই, আধুনিক জ্যোতিবির্জ্ঞান (Astronomy) অনেক মুসলিম মনীষীদের মৌলিক গবেষণা এবং অধ্যয়নের নিকট প্রভূতভাবে ঋণী। উদাহরণস্বরূপ আল-সুফী, আল-বিরুণি, আল-জারকালি প্রমুখ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নাম করা যায়। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, এসব মনীষীরা ক্বোরাণ-এর সূত্র ধরে কিছুই আবিষ্কার করেননি। কেননা ক্লাসিক্যাল ইসলাম বা স্বর্ণ যুগে (The Golden Age of Islam) মুসলমান মনীষীরা যতটা না ছিলেন আচার-সর্বস্ব মুসলমান, তার চাইতে অধিক তাঁদের পরিচিত ছিল 'যুক্তিবাদী' মনীষী হিসেবে। এঁদের সম্পর্কে পাকিস্তানের বিখ্যাত নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানী এবং কায়েদে-এ-আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পারভেজ হুদবাইয়ের মনতব্য প্রণিধানযোগ্যঃ

'.....ইসলামের স্বর্ণ যুগে বিজ্ঞান অগ্রগতি লাভ করেছিল কারণ- ইসলামের অভ্যন্তরে তখন সক্রিয় ছিলেন মুতাজিলা নামধারী শক্তিশালী যুক্তিবাদী ঐতিহ্যের ধারক একদল চিন্তাবিদ। 'সবকিছুই পূর্ব-নির্ধারিত এবং আল্লাহর কাছে আত্ম-সমর্পন ব্যতিত মানুষের অন্য কোন উপায় নেই' --নিয়তীবাদীদের এ মতবাদের তীব্র বিরুদ্ধাচারন করে মুতাজিলারা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মুতাজিলারা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতায় ছিলেন, জ্ঞান তখন সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে গোঁড়া ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম আল-গাজালির নেতৃত্বে ইসলামী রক্ষনশীলতার পুনাবির্ভাব ঘটে। আল-গাজালি যুক্তির স্থলে দৈব বাণী এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির স্থলে নিয়তিকে তুলে ধরেন। কার্য এবং ক্রিয়ার (cause and effect) সম্পর্ককে তিনি অস্বীকার করেন এই বলে যে, মানুষের ভবিষ্যত জানার শক্তি নেই, কেবল স্রষ্টিকর্তা এ বিষয়ে অবগত। গণিতশাস্ত্রকে আল-গাজালি 'ইসলাম বিরোধী' এবং 'মানব মনের জন্য ক্ষতিকারক' বলে মন্তব্য করেন। গোঁড়ামির জালে ইসলামের সমৃদ্ধি আটকা পড়ে যায়। মহামতি খলিফা আল-মামুন এবং হারুন-আল-রশিদ এর শাসনামলে রাজদরবারে মুসলিম, খ্রীস্টান এবং ইহুদী মনীষীরা একত্রিত হয়ে জ্ঞান -চর্চা এবং মত-বিনিময় করার যে প্রবনতা বহাল ছিল, তা পরবর্তীকালে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্বে সহিষ্ণু-তা, মেধা এবং বিজ্ঞানের মৃত্যু ঘটে। যুক্তিবাদী ধারার সর্বশেষ মুসলিম মনীষী হচ্ছেন চতুর্দশ শতাব্দীর আবদাল রাহমান ইবনে খালেদুন।'

লক্ষ করার মত একটি ব্যাপার হচ্ছে, ক্লাসিক্যাল ইসলাম যুগের অনেক মুসলমান মনীষীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-পর্যবেক্ষণ স্বয়ং ক্বোরাণের অনেক আয়াতকে 'অযৌক্তিক' এবং 'অবৈজ্ঞানিক' প্রমাণ করেছে। যেমনঃ ক্বোরাণের বর্ণনা অনুযায়ী, সূর্য অস্তমিত হয় একটি 'পঙ্কিল জলাশয়ে' বা muddy spring-এ (১৮:৮৬), তেমনি উদিত হয় একটি বিশেষ স্থান থেকে (১৮:৯০)। আমরা জানি, খালি চোখে সূর্য পুর্বাকাশে উদিত হয় এবং পশ্চিমাকাশে অস্ত যায় বলে মনে হলে ও বিজ্ঞানের বিচারে তা আসলে সত্য নয় কেননা, মহাশূন্যে অবস্থিত রয়েছে আমাদের সৌরজগতটি এবং সূর্য সেটির কেন্দ্র। পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন অবিরত ঘুরছে, ঠিক তেমনি এরা নিজেদের কক্ষ পথে হচ্ছে আবর্তিত অর্থাৎ, ঘূর্ণায়মান লাটিমের বেলায় যেমনটি হয়। প্রায় ২৪ ঘন্টায় পৃথিবী নিজস্ব কক্ষপথে একবার ঘুরে। এই কারণে সৌর জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত সূর্যের সকল আলো একই সাথে এসে গোলাকার ও ঘূর্ণায়মান পৃথিবী গায়ে এসে পড়তে পারে না। যেখানে পড়ে, সেখানটায় হয় দিন; বাকী জায়গায় অন্ধকার বা রাত। কিন্তু ক্বোরাণে বর্ণিত গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কিত বক্তব্যের সাথে বিজ্ঞানের এসব তথ্যের কোন মিল নেই। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। গ্রীক ধারণার বশবর্তী হয়ে সে সময় প্রায় সকলে অজ্ঞতাবশত বিশ্বাস করতেন- পৃথিবীর আকার গোলাকৃতি নয়, বরং চ্যাপ্টা; এবং পৃথিবী হচ্ছে মহাবিশ্বের কেন্দ্র (একে বলা হয় এরিস্টটলের *ভূ-কেন্দ্রিক মহাবিশ্ব সম্পর্কিত* ***মতবাদ*** বা *geocentric theory of universe)*| তবে মুসলিম গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ আল-বিরুনি সে সময় ও (মৃত্যু ১০৪৮ সাল) বিশ্বাস করতেন যে , ঘূর্ণনশীল মহাবিশ্বের আকৃতি হচ্ছে গোল এবং মোটে ও চ্যাপ্টা নয়। বিজ্ঞানী বলতে হলে তাই আল-বিরুণিকে বলা উচিৎ, মুহম্মদকে নয়।

উপরের তথ্যগুলি দ্বারা এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয় যে, ক্বোরাণ আসলে মানুষেরই তৈরী একটি গ্রন্থ। তা না হলে, সক্রেটিসের ভ্রান্ত মতবাদগুলি কি করে *সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ* আল-ক্বোরাণের পাতায় চলে আসল? ক্বোরাণে এরকম অবৈজ্ঞানিক এবং অসামঞ্জস্যে ভর্তি বর্ণনার আর ও অনেক উদাহরণ রয়েছে। ক্বোরাণের একটি আয়াত (২:২৯) অনুযায়ী, আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বেহেস্ত বা স্বর্গ সৃষ্টিতে মনযোগ দিয়েছেন। আবার একই ক্বোরাণের অন্য স্থানে (৭৯:২৭-৩০)বলা হয়েছে, প্রথমে স্বর্গ বা বেহেস্ত তৈরীর কাজে আল্লাহ হাত দেন। অতঃপর দিন-রাত এবং সব শেষে পৃথিবী। আরেক জায়গায় বেহেস্ত এবং পৃথিবী তৈরীর মোট সময় সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ (নাকি, মুহম্মদ?) তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। যেমনঃ ক্বোরাণের কিছু কিছু আয়াত (৭:৫৪, ১০:৩, ২৫:২৯) অনুযায়ী আল্লাহ সর্বমোট ছয় দিনে বেহেস্ত ও পৃথিবী বানিয়েছেন; কিন্তু একই ক্বোরাণের ৪১:৯ আয়াত অনুযায়ী, আল্লাহ দুই দিনে পৃথিবী তৈরী করেছেন এবং সেখানে প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরীতে সময় লেগেছে আর ও চার দিন (আয়াত ৪১:১০) । সবশেষে বেহেস্ত তৈরীতে সময় লেগেছে আর ও দুই দিন (আয়াত ৪১:১২ অনুযায়ী) অর্থাৎ, এই হিসেব অনুযায়ী, বেহেস্ত ও পৃথিবী সৃষ্টিতে মোট ব্যয়িত সময় হচ্ছে (২+৪+২) বা, সর্বমোট ৮ দিন। তাহলে বেহেস্ত ও পৃথিবী সৃষ্টিতে সর্বমোট ব্যয়িত সময়ের ক্ষেত্রে মহাসত্য গ্রন্থ আল-ক্বোরাণের কোন বিবরণটি আসলে সত্য? ছয় (৬) দিন, নাকি আট (৮) দিন?

পাঁচঃ বিবর্তন তত্ত্ব, ক্বোরাণ এবং হারন ইয়াহিয়ার ইসলামিক সাইনস্ ঃ

গ্যালিলিওর পৃথিবী বিষয়ক ঘূর্ণন তত্ত্বের মতই ডারউইন-এর প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ব্বির্তন তত্ত্ব (evolution by natural selection) শুরুতেই খৃস্টান ধর্মীয় যাজক, এর পৃষ্ঠপোষক এবং শিষ্যদের প্রচন্ডভাবে ক্ষেপিয়ে তুলে। ডারউইনের তত্ত্ব সম্পর্কে মিথ্যা বিভ্রান্তি ছড়ানো শুরু হয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশলে। অনেক খৃস্টান ও মুসলিম দেশ (আমাদের সময়ে অর্থাৎ ১৯৯২ সালে কলেজের ইন্টারমিডিয়েট লেভেল বায়োলজিতে বিবর্তন তত্ত্ব চালু থাকলে ও বর্তমানে তা বাংলাদেশে ও নিষিদ্ধ) এমনকি খোদ আমেরিকার কয়েকটি স্টেটের স্কুল-কলেজে এখন ও ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব নিষিদ্ধ এই (অপ)যুক্তিতে- এটি বাইবেল-ক্বোরাণে বর্ণিত ঈশ্বর ধারণার পক্ষে সরাসরি হুমকি স্বরূপ; কেননা বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী, ঈশ্বর মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম আদমকে সৃষ্টি করেন, অতঃপর আদমের বুকের পাঁজরের বাম অস্থি থেকে (!) হাওয়াকে সৃষ্টি করেন তাঁর সংগিনী হিসেবে। ক্বোরাণে ও রয়েছে এই বর্ণনার পুনরাবৃত্তি (২:৩০-৩৮)। কিন্তু ডারউনের বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী, পৃথিবীতে মানুষ হঠাৎ করে আসেনি; বরং আদি কোষী প্রাণি হিসেবে যাত্রা শুরু করে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে কোটি কোটি বছরে অল্প অল্প করে সাধিত পরিবর্তন, অভিযোজন তথা প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। পরিবর্তনের ধাপটি এ রকমঃ

আদি কোষীয় প্রাণি→ বহুকোষী জীব → সামুদ্রিক জীব → ভূমির জীব → উভচর প্রাণি (এম্পিবিয়ান) →

রেপ্টাইলস (যেমনঃ ডায়নোসর) → স্তন্যপায়ী প্রাণি (উদাহরণ- মানুষ)

রেপ্টাইলস (যেমনঃ ডায়নোসর) → পাখি জাতীয় প্রাণি

অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ার চুড়ান্ত ধাপে এসেছে মানুষ। কাল ক্রমে দেখা গেল ডারউইনের কথাই সঠিক। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, এ পর্যন্ত প্রাপ্ত এক কোষী প্রাণির জীবাশ্ম (fossil) রেকর্ডের মধ্যে সর্বাধিক পুরাতন জীবাশ্মের বয়স কম পক্ষে ৩.৫ বিলিয়ন বছর। খৃস্টান মোল্লা-পুরোহিতেরা যখন দেখল, ডারউইনের তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক গ্রহনযোগ্যতাকে এত সহজে নিশ্চিহ্ন করতে গেলে তাঁরা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে, তখন তাঁদের কেউ কেউ ডারউইনের তত্ত্বেকে স্বীকৃতি দিয়ে টিকে থাকাটাই শ্রেয়তর মনে করল। ১৯৯৬ সালে পোপ জন পল II স্বয়ং ঘোষণা দিলেন, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের সাথে বাইবেলের বর্ণনার কোনই বিরোধ নেই। আর ও মজার ব্যাপার, ২০০৫ সালে ভ্যাটিকান ডারউইনের পক্ষালম্বন করে এক ঘোষনায় ক্রিয়েসনিষ্ট (creationist) হিসেবে পরিচিত খৃস্টান মৌলবাদীদের (এরা বাইবেলের জেনেসিসের বর্ণনাকে একমাত্র সত্য এবং ডারউইনের তত্ত্বকে মিথ্যা বলে মনে করে) কড়া সমালোচনা করে এই বলে, ডারউইনের তত্ত্বের সাথে বাইবেলের বর্ণনা সামঞ্জস্যপূর্ণ; বাইবেলের বর্ণনাকে সরাসরি গ্রহণ না করে সেগুলিকে রূপক বা মেটাফরিক্যাল অর্থে গ্রহণ করা উচিত। তাতে অবশ্য বিবর্তন তত্ত্বের ওপর খৃস্টান-মুসলিম এবং অন্যান্য মৌলবাদী গোষ্ঠীর আক্রমণ কমেনি। তথাকথিত সৃষ্টিতত্ত্ব বিজ্ঞান (creation science), ইন্টালিজেন্ট ডিজাইন (intelligent design) ইত্যাদি চমকপ্রদ মোড়কে ধর্মীয় অপবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের নামে চালিয়ে দেয়ার নিরন্তর চেষ্টার আজ অবধি তাই কোন কমতি নেই।

গত কয়েক বছর থেকে আধুনিক শিক্ষিত অনেক ধর্মীয় মুসলমানদের মাঝে খৃস্টান ক্রিয়েসনিস্টদের অনুকরণে আবির্ভূত হয়েছেন হারূণ ইয়াহিয়া (ছদ্ম)নামের একজন ইসলামিক ক্রিয়েসনিস্ট। তুরস্কের মুসলিম মৌলবাদী নেতা আদনান আক্তারের অধীন “Science Research Foundation” (*Bilim Arastirma Vakfi* - BAV) হচ্ছে হারুণ ইয়াহিয়ার নামে লিখিত তথাকথিত ইসলামিক সাইনস্ বিষয়ক সকল পুস্তক, ইন্টারনেট মেটেরিয়াল, লিফলেট, ভিডিও এবং কনফারেনস্ এর প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক। BAV-এর অর্থের উৎস সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান যদি ও দাবী করা হয় BAV চলে ডোনেশনের মাধ্যমে। বেশ আকর্ষনীয় ভংগিতে হারুণ ইয়াহিয়ার নামে লেখা এসব বই-পুস্তক-ভিডিও অত্যন্ত সুলভ মূল্যে তুরস্কের স্কুল-কলেজ এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্রি ও বিতরণ করা হয়। ইংরেজী ছাড়া ও রাশিয়ান, পোলিশ, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, আরবিক সহ অন্যান্য ভাষায় ও এসব বই-পুস্তক অনুদিত হয়েছে এবং হচ্ছে। হারুণ ইয়াহিয়া গ্যাং-এর সৃষ্টি বিজ্ঞানের মূল টারগেট আংশিকভাবে পশ্চিমা ঘরানার দেশ তুরস্ক এবং পশ্চিমা দেশগুলিতে বেড়ে ওঠা মুসলিম ইমিগ্রান্ট এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা হলে ও বর্তমানে বিশ্বব্যাপী শিক্ষিত অনেক মুসলমানদের কাছে হারুণ ইয়াহিয়া একটা পরিচিত নাম। তবে খৃস্টান ক্রিয়েসনিষ্টদের সাথে হারুণ ইয়াহিয়ার ইসলামিক সাইনস্ বিষয়ক অপপ্রচারণার যে সব মিল, তা মোটে ও কিন্তু কোন এ্যাকসিডেন্টাল ব্যাপার নয়। নীচে দেখুনঃ

- হারণ ইয়াহিয়ার নামে প্রচারিত ক্বোরাণের পক্ষে বিবর্তন তত্ত্ব বিরোধী এসব ক্রিয়েসন সাইনস্-এর মুসলিম প্রবক্তাদের সাথে আমেরিকার খৃস্টান ক্রিয়েসনিষ্টদের প্রতিষ্ঠান Institute for Creation Research (ICR) এর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। এরা এক সাথে একাধিক কনফারেনস্ ও করেছে।
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হারুণ ইয়াহিয়ার আর্গুমেন্টের সূত্র হচ্ছে বিবর্তন বিরোধী খৃস্টান মৌলবাদীদের আর্গুমেন্ট (creationism science, intelligent design দুটোই) থেকে ধার করা। হারুণ ইয়াহিয়া এগুলিকে কেবলমাত্র ইসলামিক লেবাস পরিয়ে চালিয়ে দেন। **লজ্জার বিষয় বৈকি যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পশ্চাতপদ মুসলমানরা অপবিজ্ঞানের কৌশল ও আজ পশ্চিমা বিশ্বের কাছ থেকে ধার করছে!**
- খৃস্টান মৌলবাদীদের মত হারুণ ইয়াহিয়ার অপবিজ্ঞানীয় প্রচারনায় ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির অপর্যাপ্ত উপস্থাপন, অপ্রাসংগিক উদ্ধৃতি এবং অনির্ভরযোগ্য রেফারেনস্-এর আধিক্য দেখা যায়।

এ ছাড়া ও ইতিপূর্বে অপবিজ্ঞানের যে সব প্যাটার্নের কথা বলা হয়েছে, সে গুলির অনেকগুলি হারুণ ইয়াহিয়ার বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শেষ কথা লেখার আগে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রাখলাম, উত্তর জানালে খুবই বাধিত হব।

- ক্বোরাণে যদি বিজ্ঞানের ব্যাপারে এতই ইংগিত থেকে থাকত, তাহলে প্রশ্ন আসে- পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ মুসলমান হলে ও বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীতে মুসলমান বিজ্ঞানীদের সংখ্যা কেন এক শতাংশের ও কম? কিংবা, কেন- পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশে যত বিজ্ঞানী রয়েছে, অমুসলিম ইসরাইলের একা রয়েছে তার চাইতে দ্বিগুন সংখ্যক বিজ্ঞানী?
- ক্বোরাণ-বাইবেলকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রেফারেনস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এমন একটি স্ট্যান্ডার্ড সাইনস জার্ণাল (যেমনঃ Nature, Science, Cell) এর নাম কেউ বলতে পারবেন কি?
- ক্বোরাণ-বেদ-বাইবেলের বর্ণনার সাথে বিজ্ঞানের যে সব আবিষ্কার বা তত্ত্বের মিল আছে বলে দাবী করা হচ্ছে, কালক্রমে সেগুলি যদি ভুল প্রমাণিত হয় (বিজ্ঞানে এমনটি হরহামেশা হয়ে থাকে যেহেতু 'অলংঘনীয় সত্য' বলে বিজ্ঞানে কিছু নেই), তখন ক্বোরাণ-বেদ-বাইবেলের ঐসব বর্ণনা/আয়াতগুলি ও কি ভুল প্রমাণিত হবে, নাকি সেগুলির নতুন কোন ব্যাখ্যা হাজির করা হবে আমাদের সামনে?

শেষ কথাঃ

প্রশ্ন আসেঃ তাহলে বিজ্ঞানের সাথে কি ধর্মের *সহাবস্থান* কখনোই সম্ভব নয়, কেবল *সংঘাতই* একমাত্র উপায়? উত্তর হচ্ছে- সহাবস্থান হতে পারে কেবলমাত্র তখনই, বিজ্ঞান এবং ধর্ম এ দুটো যে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা বিষয় এই সত্য মেনে নিয়ে কিন্তু মিশ্রণ কখনোই সম্ভব নয়। অনেকে এ ও বলতে পারেন, বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সকলেই কি তাহলে নাস্তিক? উত্তরে বলব, না। বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের অনেকেই আস্তিক, কেউ কেউ নাস্তিক। কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। একজন বিজ্ঞানীর ধার্মিক পরিচয় থাকতেই পারে, তাতে দোষের কিছু নেই। ধর্ম এবং ঈশ্বর বিষয়ে সকল বিজ্ঞানীকে যে আইনস্টাইনের দৃষ্টিভংগিকেই গ্রহণ করতে হবে, এমনটি ও এখানে বলা হচ্ছে না। কিন্তু একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানী কখনোই দাবী করবেন না যে, ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিজ্ঞান নিহিত। এই অপকর্মটি যাঁরা করে আসছেন তাঁরা প্রায় সকলেই করছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় আত্ম-প্রচার অথবা/এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট (রাজনৈতিক সহ) কোন কারণে। কেননা মানব সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন, মানবতাকে ভালবাসেন- এমন ব্যক্তিমাত্রই জানেন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরা ভৌগলিক সীমারেখা তথা জাত-কাল-ধর্মের উর্দ্ধে; এরা সমস্ত মানবতার সম্পদ। আইনস্টাইনের জীবনকে সবচেয়ে বেশী যা প্রভাবিত করেছিল তা হচ্ছে: মমতা, সত্য এবং সৌন্দর্য। আর সত্য ও সুন্দরের পূজারী মানুষেরা এবং তাঁদের কর্ম কারো একচোটিয়া সম্পত্তি নয়, তাতে রয়েছে আমাদের সকলের সমান অধিকার। বিজ্ঞানকে ধর্মীয় লেবাস পরানোর অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তাই প্রতিটি বিবেকবান ও সচেতন বিশ্বনাগরিকের সোচ্চার হওয়া উচিৎ।

তথ্যসূত্রঃ

- Pazameta, Zoran. 1999. Scienece vs. Religion Teach the Difference, Resolve the Conflict. *Skeptical Inquirer* 23 (4):37-39
- Mayr, Ernst. 1999. The Concerns of Science. *Skeptical Inquirer* 23 (4):65
- Edis, Taner.World Designed by God. Science and Creationism in Contemporary Islam.

(www2.truman.edu/~edis/writings/articles/CFI-2001.pdf)

- Hoodbhoy, Pervez. 1992. *Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality.* Zed Books.
- Science and Creationism: A view from the National Academy of Science (http://www.nap.edu/html/creationism/origin.html)
- http://www.creationtheory.org/HateMail/Kathrmann.shtml
- The Skeptic Dictionary (http://skepdic.com/creation.html)
- Sandbek, Terry. Brain Typing: The Pseudoscience of Cold Reading (http://www.americanboardofsportpsychology.org/Portals/24/BrainTypingSANDBEK.doc)
- (জাহেদ আহমদ) বিজ্ঞান, বিজ্ঞান মনস্কতা বনাম কোরাণিক বিজ্ঞান. *যুক্তি,* ফেব্রুয়ারী ২০০৭

জাহেদ আহমদ, বায়োটেকনোলজিতে মাস্টার্স। মুক্তমনা হিউম্যানিস্ট ফোরামের কো-মডারেটর এবং সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য। ই-মেইলঃ worldcitizen73@yahoo.com